শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ:

প্রশ্ন-১: বিদ্যালয়ে ক্রীড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের উপকারিতা বর্ণনা কর।

খেলাধুলায় অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা রয়েছে। যেমন- শারীরিক উপকারিতা, মানসিক উপকারিতা, সামাজিক উপকারিতা ইত্যাদি। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো:

শারীরিক উপকারিতা	মানসিক উপকারিতা	সামাজিক উপকারিতা
➢ ঘুম ভালো হয়। ➢ পেশি ও হাড় মজবুত হয়। ➢ ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ➢ স্মৃতিশক্তি উন্নত হয়। ➢ শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে।	➢ মন ভালো থাকে। ➢ আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ➢ মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। ➢ সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ➢ কঠিন/বিরূপ ঘটনা মোকাবেলায় সক্ষমতা বাড়ে।	➢ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। ➢ একসাথে/দলগত কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়। ➢ বন্ধুত্ব দৃঢ় হয় ও নতুন বন্ধু তৈরি হয়। ➢ সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়। ➢ বিরোধমূলক পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-২: আমরা কোন পরিস্থিতিতে মানসিক চাপ অনুভব করি?

আমাদের সাথে ভালো কোনো ঘটনা হলে আমাদের মন ভালো থাকে, আবার অপ্রীতিকর ঘটনায় আমাদের মন খারাপ হয়। যেমন- কোনো কাজ ভালো করার পর যখন কেউ প্রশংসা করে তখন আমরা খুশি হই, বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে গল্প করলে আমরা আনন্দিত হই, বন্ধুদের সাথে মনোমালিন্য হলে আমরা কষ্ট পাই, পরীক্ষা বা কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজের আগে আমাদের মানসিক চাপ তৈরি হয়। অর্থাৎ আমরা কোনো কাজ যেভাবে করতে চাই তা যখন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে করতে পারি না তখন মানসিক চাপ অনুভব করি।

প্রশ্ন-৩: মানসিক চাপ তৈরি হলে কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়?

খেলার মাঠে, বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বা বন্ধুদের তুলনায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না হওয়া ইত্যাদি কারণে আমাদের মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি হয়। এই সকল ঘটনা বা পরিস্থিতির কারণে অনুভূত ভয়, কষ্ট ও মানসিক চাপের ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা করা না গেলে অনেক ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা, কান্নাকাটি করা, সবকিছুর জন্য নিজেকে দোষারোপ করা, কোনো কাজ বা খেলায় অনীহা, ঘুম না হওয়া, একা একা থাকা, খাবারে অরুচি বা অত্যধিক পরিমাণে খাবার গ্রহণ করা ইত্যাদি। তাই বিভিন্ন অপ্রীতিকর বা প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে আবেগের ইতিবাচক ব্যবস্থাপনা অনেক জরুরী।

প্রশ্ন-৪: মানসিক চাপ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?

নিচে আবেগ ব্যবস্থাপনার কিছু ফলপ্রসূ উপায় দেওয়া হলো-

- নাক দিয়ে গভীর শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়া (তিন থেকে চার বার)।
- বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথা শেয়ার করা।
- অন্যকে দোষারোপ না করে ভুল সংশোধন করা।
- নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখা, যেমন- আমি জানি আমি পারব, আমি strong, আমি capable ইত্যাদি।
- অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের অনুভূতি হতে পারে সে বিষয়ে আগে থেকেই সচেতন থাকা। যেমন- সহপাঠী যখন এড়িয়ে চলে তখন মন খারাপ হয়, কেউ কটু কথা বার বার বললে রাগ হয়, সকলের সামনে কোনোকিছু উপস্থাপন করার পূর্বে ভয় কাজ করে ইত্যাদি।
- পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ফলপ্রসূ উপায় জানা।
- পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আমি সক্ষম' এই কথাটি মনে মনে নিজেকে বলা।

প্রশ্ন-৫: বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বন্ধুত্ব হলো দুই বা ততোধিক মানুষের মধ্যে একটি নিঃস্বার্থ বন্ধন।যাদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি বোঝাপড়া, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা থাকে। সেক্ষেত্রে বন্ধুত্বকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের খুব কাছের একটি অংশ মনে করা হয়। তবে অনেক সময় বিদ্যালয়ে সহপাঠী বা বন্ধুরা এমন কিছু আচরণ করে যার কারণে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, যেমন- বন্ধু কিংবা সহপাঠীকে কষ্ট দিয়ে কথা বলা, সহপাঠী বা বন্ধুর বিপদ নিয়ে হাসাহাসি করা, বন্ধুর প্রয়োজনে সহায়তা না করা, বৈষম্যমূলক আচরণ করা, শ্রেণিকক্ষে বন্ধুর পাশে বসতে না চাওয়া, বন্ধুর জিনিস কেড়ে নেওয়া বা নষ্ট করা, মাঠে বা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একজন বন্ধুকে বাদ দিয়ে অন্য বন্ধুদের সাথে খেলা করা, এভাবে 'বুলিং'-এর স্বীকার হওয়া।

এসবের কারণে অনেক সময় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে থাকে। বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। চলার পথে আমাদের বন্ধুর প্রয়োজন হয়। তাই বন্ধু, সহপাঠী তথা সকলের সাথে উত্তম আচরণ করা প্রয়োজন। আমরা বন্ধুর সাথে উত্তম আচরণ করবো। কেননা, বন্ধুর সাথে নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় সব কথা বলা যায়, ভালো বন্ধু আমাদের ন্যায়ের পথে চলতে অন্যায় না করতে সাহায্য করে, বন্ধুর কাছে যে কোনো ধরনের আবেগ প্রকাশ করা সহজ হয়, দোষ-ত্রুটি নির্ভয়ে বন্ধুর কাছে স্বীকার করা যায়, প্রকৃত বন্ধু যেকোনো বিপদে বন্ধুর পাশে থাকে। সুতরাং উত্তম বন্ধু পাওয়া প্রতিটি মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আমরা যদি ভালো বন্ধু পেতে চাই, তাহলে বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণ করে বন্ধুত্বের গুণগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন-৬: কীভাবে সহপাঠীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে?

বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল মানুষের সাথে একই বছরে, একই বিষয়ে পড়ালেখা ও উঠাবসা করা হয় তাদের সহপাঠী বলে। এই সকল সহপাঠীদের মধ্য থেকে যে সকল সহপাঠীর সাথে সুসম্পর্ক হয়, যাদের সাথে কথা বলে ভালো লাগে, মিশতে ভালো লাগে এবং যারা একে অপরকে বুঝতে পারে ও সহায়তা করে তাদেরকে বন্ধু বলে।বিদ্যালয়ে সকলের সাথে সম্মানজনক তথা সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহপাঠীদের সাথে কিছু আনন্দের ঘটনা আবার কিছু কষ্টের ঘটনা ঘটে। একই ঘটনার প্রেক্ষিতে একেকজন শিক্ষার্থী একেকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যেমন- বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোনো একটি দল হেরে গেলে দেখা যায় কেউ কষ্ট পেয়ে কাঁদছে, আবার কেউ বিষয়টা মেনে নিয়েছে, কেউবা জিনিসপত্র নষ্ট করছে। অর্থ্যাৎ মানসিক চাপ বা কষ্ট সামলানোর ধরন একেক জনের একেক রকম। তেমনি আনন্দ প্রকাশ করার ধরনও ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হয়। সুতরাং সকল শিক্ষার্থী তাদের কষ্টের অভিজ্ঞতা ও আনন্দের অভিজ্ঞতা কীভাবে মোকাবিলা করেছে, সেটা জানা প্রয়োজন। কেননা আবেগের ইতিবাচক তথা ফলপ্রসূ বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে আমরা সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবো।

প্রশ্ন-৭: উত্তম আচরণ ও সহমর্মিতা প্রকাশের উপায়গুলো বর্ণনা কর।

আমাদের ব্যক্তিত্বের বিষয়গুলো ফুটে ওঠে আচরণের মাধ্যমে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সত্য কথা বলা, সম্মান করা, দয়ালু হওয়া, বিপদে বন্ধুর পাশে দাঁড়ানো এই গুণগুলো থাকা অপরিহার্য। তবে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় বিদ্যালয়ে একজন সহপাঠীকে বুলিং করা হচ্ছে। যারা বুলিং করছে তারা হয়তো নিজেরাও বুঝতে পারছে না যে বুলিংয়ের কারণে সেই শিক্ষার্থী মানসিক ও শারীরিকভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিম্নে উত্তম আচরণ ও সহমর্মিতা প্রকাশের উপায়গুলো আলোচনা করা হলো-

- বন্ধু বা সহপাঠী যদি খেলায় হেরে যায় তাহলে তাকে নিয়ে হাসাহাসি না করা।
- বন্ধুর কষ্টে বা বিপদে তাকে সহযোগিতা করা।
- সহপাঠী বা বন্ধু কোনো ভুল-ত্রুটি করলে সেটা নিয়ে কটাক্ষ না করা।
- সহপাঠীর কোনো সাহায্য লাগবে কি না, সেটা জানতে চাওয়া।
- বন্ধু বা সহপাঠী যদি পড়া না বোঝে, সেটা বুঝতে সহযোগিতা করা।
- বন্ধুকে অবহেলা না করা।
- বিদ্যালয়ে নতুন কোনো সহপাঠী আসলে তাকে সাদরে গ্রহণ করা।
- সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

প্রশ্ন-৮: লিঙ্গ সমতা কী ? লিঙ্গ সমতা বজায় রাখায় উপায়গুলো বর্ণনা কর।

লিঙ্গ সমতা বলতে ছেলেমেয়ের সমান অধিকার, দায়িত্ব, সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে ভেদে অধিকার, সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। তবে বর্তমানে এ বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা চলছে। যার ফলে লিঙ্গ সমতা তথা 'সকলের

জন্য সমান সুযোগ' নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বিদ্যালয় থেকেই আমাদের মধ্যে জ্ঞান, মূল্যবোধ ও অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ লিঙ্গ সমতার বিষয়টি জানা থাকা দরকার। আমরা কীভাবে লিঙ্গ সমতা বজায় রাখতে পারি তার উপায়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

- খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে সুযোগ দেয়া।
- শ্রেণিকক্ষ সাজানো কিংবা খেলার মাঠ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা বজায় রাখা।
- সবারই ভদ্রভাবে আবেগ অনুভুতি প্রকাশ করার অধিকার থাকবে। সমাজে কোন কোন কাজ মেয়েরা আবার কোন কোন কাজ ছেলেরা করলে নেতিবাচকভাবে দেখা যাবে না।
- শ্রেণিকক্ষ বা ঘর সাজানো, রান্না করা ইত্যাদি কাজ ছেলে বা মেয়ে যে কেউ করার মানসিকতা রাখতে হবে।

প্রশ্ন-৯: আমরা কীভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে সহনশীল আচরণ ও সহযোগিতার অভ্যাস তৈরি করতে পারি?

যে সকল শিক্ষার্থীর শারীরিক কিংবা মানসিক কারণে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী বলা হয়। দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, অন্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য বা বিভিন্ন প্রয়োজনে অন্যদের বিশেষ সহযোগিতার দরকার হয়। এসকল শিক্ষার্থী আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীর মতো তাদেরও সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে সমান অধিকার রয়েছে। নিচে কিছু উপায় দেওয়া হলো যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিবেশ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহজতর হয়-

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের প্রথম সারিতে বসার ব্যবস্থা করা।
- পাঠদানে কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া।
- সহজ ভাষায় তাদের সাথে কথা বলা।
- পরীক্ষার হলে অতিরিক্ত সময় দেওয়া।
- তাদের যেকোনো সমস্যায় সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা।
- শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যেন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করা।
- তারা কষ্ট পাবে এমন কথা না বলা।
- তাদের সাথে মিলেমিশে খেলাধুলা করা।

প্রশ্ন-১০: খেলাধুলায় দুর্ঘটনার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

খেলাধুলা করার সময় শ্রেণিকক্ষে, খেলার মাঠে বা অন্য যে কোনো স্থানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনার কারণ ও উপায় সম্পর্কে ধারণা থাকলে বাড়িতে, বিদ্যালয়ের মাঠে এসব দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব। আর যদি দুর্ঘটনা ঘটেই যায় তাহলে তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে)। দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলার জন্য কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলতে পারলে শিক্ষার্থীরা দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। অর্থাৎ দুর্ঘটনা যেন না ঘটে তার বাবস্থা নেয়া খুবই জরুরি। এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়াম, খাওয়া ও বিশ্রামের রুটিন ঠিক রাখতে হবে।

প্রশ্ন-১১: খেলাধুলায় দুর্ঘটনার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো কী কী?

- খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার পূর্বে শরীরকে খেলার উপযোগী (ওয়ার্ম আপ) করে নিতে হবে।
- ভেজা ও পিচ্ছিল মাঠ, কাচের টুকরো ও ইটের টুকরোযুক্ত মাঠ এবং অসমতল মাঠ বর্জন করতে হবে।
- বড় গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তারের কাছে খেলাধুলা করা যাবে না।
- খেলাধুলার সময় খেলোয়াড় সেফগার্ড ব্যবহার করেছে কি না, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।
- নিয়ম মেনে খেলাধুলা করতে হবে।

প্রশ্ন-১২: খেলাধুলায় দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কী বোঝায়?

আমরা শ্রেণিকক্ষে, খেলার মাঠে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই। দুর্ঘটনায় যথাসময়ে আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারলে আহত ব্যক্তি মারাত্মক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে খেলতে বা দৌড়াতে গিয়ে আমাদের

শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে যায় ও রক্তক্ষরণ হয়। এমতাবস্থায় আমরা যেন তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ ও প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারি, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যেকোনো দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে।

প্রশ্ন-১৩: খেলাধুলায় দুর্ঘটনার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা কীভাবে নেয়া যায় ?

- ফার্স্ট এইড বক্স সব সময় রেডি রাখতে হবে।
- খেলাধুলার মাঠে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সাথে সাথে বড়দের সাহায্য নিতে হবে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে নিজেকে শান্ত রাখতে হবে এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করতে হবে।
- হাঁটুতে আঘাত পেলে প্রাথমিক পর্যায়ে নাড়াচাড়া না করে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোন অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভালোভাবে দেখতে হবে, যতটুকু সম্ভব নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

প্রশ্ন-১৪ : চামড়া ছিলে গেল তার প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে দিতে হবে?

খেলতে গিয়ে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে পড়ে গিয়ে, জুতার কারণে, ইট ও পাথরের টুকরোর আঘাতে চামড়া ছিলে যায়, অনেক সময় রক্ত জমাট বাঁধে। এমন অবস্থায় আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।ছিলে যাওয়া জায়গায় ঠান্ডা পানি বা বরফ লাগাতে হবে। পরিষ্কার তোয়ালে বা কাপড় ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বেঁধে রাখতে হবে, জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান মুছে অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৫ : পেশীতে টান ধরলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে দিতে হবে?

খেলার সময়, ভারী কোনো বস্তু তোলার সময় পেশিতে টান ধরে। এ ক্ষেত্রে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ রকম অবস্থা হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এই সময় সব ধরনের ব্যায়াম বা খেলাধুলা বন্ধ করে দিতে হবে। ২-৩ ঘণ্টা পরপর ২০ মিনিটের জন্য বরফের ব্যাগ দিয়ে রাখতে হবে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটি ব্যান্ডেজ দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে এবং উঁচু স্থানে বা একটি বালিশের উপর রাখার চেষ্টা করতে হবে। হালকা স্ট্রেচিং করলে টান ধরা পেশি দ্রুত স্বাভাবিক হয়।

প্রশ্ন-১৬ : ফুলে গেলে এবং মচকে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে দিতে হবে?

খেলার সময় মুখোমুখি সংঘর্ষে, পড়ে গিয়ে বা অন্য কোনোভাবে আঘাতের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায়।এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো বরফ লাগানো। ফোলা অংশটি যেন শক্ত কোনো কিছুর সংস্পর্শে না থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

মচকানো: খেলতে গিয়ে অনেক সময় শিশুর হাত ও পা মচকে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা: মচকানো স্থানটিকে আরামদায়ক অবস্থানে রাখতে হবে। এরপর তুলা দিয়ে বেশ পুরু করে আহত স্থানের উপর ও নিচে দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ করতে হবে। মচকানো স্থানে ব্যাথা হলে বরফ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ঠাণ্ডা সেক দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৭: নাক দিয়ে রক্ত পড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা কী?

নাক দিয়ে রক্ত পড়া: খেলতে গিয়ে বলের আঘাতে, একে অপরের মুখোমুখি সংঘর্ষে অনেক সময় শিশুদের নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: এ ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে বলতে হবে। নাক হালকাভাবে চেপে মাথাটা হালকা একটু উঁচু করে রাখতে হবে, বরফ বা ঠান্ডা পানি লাগাতে হবে।

প্রশ্ন-১৮: আহত ব্যক্তির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কীভাবে এগিয়ে আসা উচিৎ?

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সহপাঠী, প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয়-স্বজন ও সাহায্যকারী সংস্থার এগিয়ে আসা উচিত। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির চিকিৎসা যদি উপযুক্ত সময়ে না করা হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস, বিকলাঙ্গতা এমনকি মৃত্যুর আশংকাও থাকে। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে সেবা প্রদানের জন্য সকলকে এগিয়ে আসা উচিত। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে দ্রুততম সময়ে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও প্রাণহানি থেকে রক্ষা করা যায়। দুর্ঘটনা ঘটলে নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী এবং সাহায্যকারী সংস্থার সহায়তা গ্রহণের জন্য তাদের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার সংরক্ষণ করতে হবে এবং সাথে সাথে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে বলতে হবে।

আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থে তাৎক্ষণিক নিকটতম হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে। সাহায্যকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে রেড ক্রিসেন্ট, ফায়ার সার্ভিস, বিএনসিসি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন-১৯: ভালো ও মন্দ স্পর্শ বলতে কী বোঝায়? কীভাবে মন্দ স্পর্শ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা যায়?

ভালো স্পর্শ- যখন কোনো ব্যক্তির স্পর্শ অস্বস্তি বা ভয় তৈরি করে না এবং নিজেকে সুরক্ষিত মনে করা যায়, সে ধরনের স্পর্শকে ভালো স্পর্শ বলে। যেমন- মায়ের জড়িয়ে ধরা, পরিচিত ও নিরাপদ কারো সাথে হাত মিলানো, কেউ হাল্কাভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ভালো স্পর্শ হিসেবে পরিচিত।

মন্দ স্পর্শ- শরীরে যখন অন্য কেউ অযাচিতভাবে স্পর্শ করে থাকে, তখন তাকে মন্দ স্পর্শ বলে। অনেক সময় শিশুরা এমনকি কিশোর-কিশোরীরাও এ ধরনের স্পর্শের বিষয়টা বা তাদের সাথে কী হচ্ছে সে বিষয়টি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না, ফলে তারা ক্রমাগত এধরনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে থাকে। এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা শিশুর মানসিক বিকাশে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানুষের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি হয়, বড় হয়ে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে অন্যের উপর ভরসা কমে যায়। তাই আমাদের মন্দ স্প-র্শের বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বিষয়টি যথাযথ ব্যক্তি ও সংস্থাকে অবহিত করা অত্যন্ত জরুরি। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি হেল্পলাইন আছে যা 'শিশুর সহায়তা ফোন' নামে পরিচিত। নাম্বারটি হলো- ১০৯৮ এই দুটি বিষয় আমাদের জানা আবশ্যক।

প্রশ্ন-২০: মন্দ স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকার কৌশলগুলো লিখো।

- কারো আচরণ ভালো না লাগলে কাছে না যাওয়া।
- কাছের মানুষ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কিছু না খাওয়া।
- কারো স্পর্শ ভালো না লাগলে বাবা-মা বা অভিভাবককে জানানো।
- মার্জিত পোশাক পরা।
- নির্জন জায়গায় একা না যাওয়া।

প্রশ্ন-২১: দৈনিক সমাবেশের মাধ্যমে আমরা কী কী শিক্ষায় অভ্যস্থ হই?

প্রতিটি বিদ্যালয়ে সমাবেশের মাধ্যমে দৈনিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সুশৃঙ্খলভাবে লাইন-ফাইল ঠিক রেখে সারিবদ্ধভাবে সমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়। তারা সমাবেশ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পর আবার সারিবদ্ধভাবে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য শ্রেণিকক্ষে ফিরে যায়। শিক্ষকের সহযোগিতায় কয়েকজন শিক্ষার্থী ধারাবাহিকভাবে সমাবেশের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাদের নির্দেশনায় সকল শিক্ষার্থী সমাবেশের কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে অনুসরণ করে। বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী একই সাথে সমাবেশ করার ফলে আমরা শৃঙ্খলাবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও একে অপরের প্রতি সহনশীল আচরণ করতে শিখি।

প্রশ্ন-২২: দৈনিক সমাবেশের ধারাবাহিক কার্যক্রম বর্ণনা কর।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন: প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। জাতীয় পতাকা আগে থেকে উঠানোও থাকতে পারে।

জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন।

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ।

শপথ গ্রহণ।

জাতীয় সংগীত পরিবেশন।

শিক্ষার্থীদের কিছু সময়ের জন্য পিটি করানো যেতে পারে।

শিক্ষক পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা দিয়ে আজকের সমাবেশ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

প্রশ্ন-২৩: কাব স্কাউটিং সম্পর্কে লিখো।

আমরা সব সময় খেলাধুলা ও আনন্দদায়ক পরিবেশে থাকতে পছন্দ করি। ইচ্ছেমতো খেলা খেলতে ও আনন্দের মাঝে থাকতে চাই। এছাড়া দলগতভাবে কাজ করে নতুন কিছু শিখতে পছন্দ করি। কাব-স্কাউটিং কার্যক্রম এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কাব-স্কাউটিং শিশুদের চৌকস, জীবনমুখী, আত্মনির্ভরশীল, কর্মঠ ও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তোলে। সর্বোপরি কাব স্কাউটিং শিশুদের দেশের প্রতি মমত্ববোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-২৪: কাব স্কাউটদের কার্যক্রম সমুহ লিখো।

কাব-স্কাউটিংয়ে যে সকল কার্যক্রম অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ:

কাব শিশুরা প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে কাব কার্যক্রম শুরু করে। কাব শিশুরা যেকোনো কাজে কখনো বিফলতার কথা চিন্তা করে না, তারা সব সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাদের নির্ধারিত পোশাক থাকে, যা দেখলে যে কেউ তাদের চিনতে পারে।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাব শিশুরা সমাজের, রাষ্ট্রের সেবামূলক কাজ করে।

অন্ধকে রাস্তা পারাপারে সহায়তা করা ও নিয়মমতো রাস্তায় চলাচলে অন্যকে সচেতন করা।

আনন্দের সাথে দুস্থ ও দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

নিয়মিত নিজ নিজ ধর্ম পালন করা।

নিজের ঘর গুছিয়ে রাখা এবং জামা-কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

বাগান করা, বৃক্ষ রোপণ অভিযানে সহযোগিতা করা।

হাঁস-মুরগি পালন, বাগান, সবজি চাষ করা।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং জাতীয় দিবস উদ্যাপনে সহযোগিতা করা।

বিশেষ ভাবে তিন আঙুলের সাহায্যে সালাম প্রদর্শন করা।

জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা সম্পর্কে জানা, দড়ি দিয়ে প্রয়োজনীয় গেরো দেওয়া, সাঁতার জানা।

অসুস্থ রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহায়তা করা ইত্যাদি। সর্বোপরি কাব কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন কাব শিশু সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: ১, ৪, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৩